ISSN - 2277- 8780

আমি অরণি

(সাহিত্য ও গবেষণামূলক ষান্মাসিক পত্রিকা)
দশম বর্ষ ● সম্মিলিত সপ্তদশ সংখ্যা
বৈশাখ ১৪২৮ - এপ্রিল ২০২১

দ্বিশত জন্মবর্ষে
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

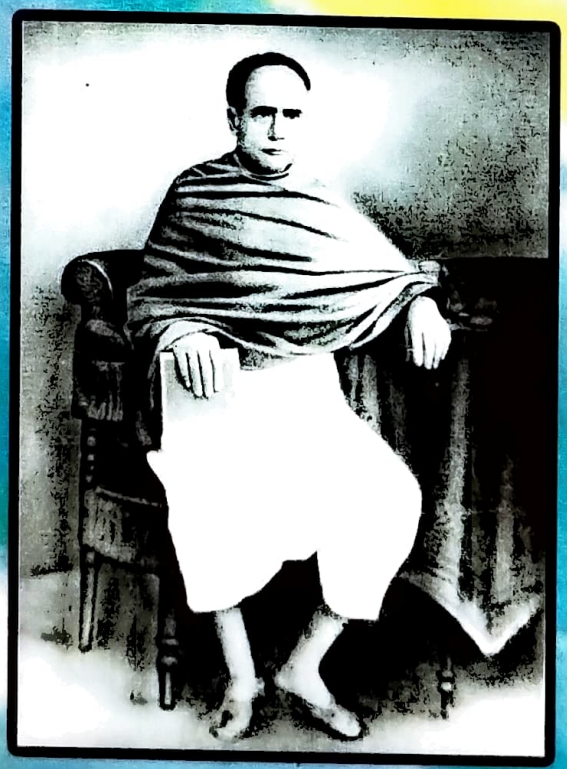

(১৮২০-১৮৯১)

সম্পাদক- সঞ্জিত দাস
সহযোগী সম্পাদক- ড. শর্মিলা দাস

ISSN-2277-8780

প্রবন্ধ ঃ -ঃ সূচীপত্র ঃ-

বিদ্যাসাগর বিতর্ক ❑ বিপুল রঞ্জন সরকার ১১

বহুমাত্রিক বিদ্যাসাগর : বর্ণময় মহাসাগর ❑ ড. সুরঞ্জন মিদ্দে ২৩

উনিশ শতকের আলোকিত ব্যক্তিত্ব ঃ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ❑ মন্দিরা রায় ২৯

বিদ্যাসাগর ❑ বাদল দত্ত ৩৫

ধর্ম প্রসঙ্গ ও বিদ্যাসাগর ❑ ড. বিশ্বম্ভর মন্ডল ৪৪

চিকিৎসক বিদ্যাসাগর — অনন্য দিশারি ❑ ড. শর্মিলা দাস ৪৮

সম্পর্কের টানাপোড়েন ঃ বিদ্যাসাগর ও নারায়ণ ❑ ড. সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ৫২

বিদ্যাসাগর, বিধবাবিবাহ, কিছু প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ ❑ দেবজ্যোতি রায় ৬১

অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব ❑ মৃণাল কান্তি উকীল ৬৭

মহামানব পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ❑ শিখা চক্রবর্তী ৭১

দ্বিশতবর্ষের আলোকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ❑ তাপস হালদার ৭৪

বাংলা বর্ণপরিচয় ও গদ্য সাহিত্যের অন্যতম রূপকার ❑ প্রশান্ত পাল ৭৬

জনশিক্ষার পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর ❑ সুকান্ত পাল ৭৯

বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঃ উনিশ শতকের দুই আলোর দিশারি ❑ স্বপন শর্মা ৮৬

বাংলা গদ্যের সার্থক রূপকার বিদ্যাসাগর ❑ ঐশ্বর্য দাস ৯০

বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন ❑ কাকলী ভৌমিক ৯৩

অপরাজেয় বিদ্যাসাগর ❑ সুকুমার বিশ্বাস (শ্রাবণীকুঞ্জ) ৯৮

কালজয়ী মনীষী পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু আলোকপাত ❑ কুমুদরঞ্জন দাস ১০২

মুক্ত মন বনাম অন্ধ বিশ্বাস ❑ মুকুল সাহা ১০৫

দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর ঃ প্রাসঙ্গিকতা ❑ লিপিকা সাহা ১১১

মাথার উপরে বিদ্যাসাগর ❑ চিত্ত সরকার ১১৫

বিদ্যাসাগর এবং একটি স্বপ্ন ❑ সোনা বিশ্বাস ১১৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাণিজ্যিক অনুষঙ্গ ❑ সঞ্জয় দাস ১১৮

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ও সমাজচেতনা পর্যালোচনা ❑ ড. মিলি চ্যাটার্জ্জী ১২৪

বিজ্ঞান, সমাজ সংস্কারক, মানবপ্রেমী ও শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ❑ ধ্রুব তালুকদার ১২৭

বর্ণদেবতা ও শিশুশিক্ষা ❑ সঞ্জয় কুমার হালদার ১৩৪

ISSN-2277-8780

দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর ঃ প্রাসঙ্গিকতা

লিপিকা সাহা

সহকারী অধ্যাপিকা, শিমুরালী শচীনন্দন কলেজ অফ এডুকেশন

উনিশ শতকের নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম প্রবাদপুরুষ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০২০ সালে বিদ্যাসাগরের দুইশত বৎসর জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সভা, সেমিনার, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করছি। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব, কর্মধারা-ই তাকে মানুষের হৃদয়ে বিরাজমান করে রেখেছে।

এখন প্রশ্ন হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত সমাজসংস্কারমূলক কাজগুলি করেছিলেন সেগুলি সেই সময়ে উপযোগী ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে বিদ্যাসাগরের জীবন, ব্যক্তিত্ব, কর্মপ্রণালীকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগর একগুয়ে, জেদি এবং মেধাবী ছিলেন। কলেজের পড়া সমাপ্ত করে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রধান পন্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন এবং ৩১ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। এইসময় সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার বিষয়বস্তু, পাঠক্রম এবং কিছু নিয়মকানুন পরিবর্তন করেন। সে সময় শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ানোর সময় নিদ্রা যেতেন এবং ছাত্ররা শিক্ষকদের পাখা করতেন। এই কুপ্রথা তিনি তুলে দিলেন। এছাড়া আরও কিছু নতুন নিয়ম চালু করলেন। যেমন সাড়ে দশটার মধ্যে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়কেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে। শিক্ষক এবং ছাত্র কেউই সেক্রেটারীর অনুমতি ছাড়া বাড়ি যেতে পারবে না। এছাড়া আবেদন ছাড়া ছাত্র এবং শিক্ষক অনুপস্থিত হতে পারবে না। আগে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে পারত। শূদ্র ছাত্রদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল সংস্কৃত কলেজে। বিদ্যাসাগর বললেন হিন্দু মাত্রই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করতে পারবে। বিদ্যাসাগরের এই দৃঢ় পদক্ষেপের জন্যই সেই সময় থেকে বর্তমানকাল অবধি শূদ্র
সন্তানেরা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে অবাধে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে।

বিদ্যাসাগর এতটাই সাহসী ছিলেন যে তিনি সাহেবদেরও ভয় পেতেন না। একবার কার্যোপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের নিকট গিয়েছিলেন, সাহেব বিদ্যাসাগরকে সম্মান না জানিয়ে টেবিলের উপর জুতো সমেত পা তুলে দিয়ে কথোপকথন করেছিলেন। পরবর্তীকালে একসময় কার্যোপলক্ষ্যে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার সাহেব দেখা করতে আসেন। তখন বিদ্যাসাগর কার সাহেবকে বসতে অনুরোধ না করে নিজের চটি জুতো সমেত পা দুখানি টেবিলের উপর তুলে কথোপকথন করেন। এতে কার সাহেব রেগে গিয়ে শিক্ষা সমাজের সেক্রেটারী ময়েট সাহেবের

ISSN-2277-8780

কাছে অভিযোগ জানান বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে। ময়েট সাহেব এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান কার সাহেব পূর্বে তার সাথে যেরূপ আচরণ করেছিলেন তিনিও তার সাথে সেইরূপ আচরণই করেছেন। এতে ময়েট সাহেব হেসে জানান যে তিনি বিদ্যাসাগরের মত তেজস্বী লোক বাংলায় দেখতে পান না। এছাড়া সাহেবদের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য তিনি ফোর্টউইলিয়ম এবং সংস্কৃত কলেজের চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছেন বহুবার। বর্তমান সমাজজীবনে বিদ্যাসাগরের মত এরকম সাহসী ব্যক্তির প্রয়োজন যাতে আমরা ক্ষমতাবান, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সামনে ভয়ে মাথা নত না করে তাদের সামনে সত্য কথা জোর গলায় বলতে পারি, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারি।

রাজা রামমোহন রায় ১৮২৯ খ্রিঃ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহায়তায় সতীদাহ প্রথা রদ করেন। এই প্রথা রদ হওয়ার ফলে বিধবাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে বাল্যবিধবাদের সংখ্যা। সমাজে তাদের এক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের দুঃখ বিদ্যাসাগরকে ব্যথিত করত। তাই বিধবাবিবাহ প্রচলনের মধ্য দিয়ে তিনি এই লাঞ্ছিত নিপীড়িত অসহায় স্ত্রীজাতিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অভিযানে মেতে উঠলেন। কিন্তু এই বিধবা বিবাহ প্রচলন করার কাজটা তৎকালীন সমাজে মোটেও সহজ বিষয় ছিল না। এই বিষয়টি সমাজের নেতৃবর্গ মেনে নিতে পারেননি। তাই বিদ্যাসাগরকে এক বিশাল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রাজা রাধাকান্তদেব বিদ্যাসাগরের বিরোধীতায় মেতে উঠলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষে বিদ্যাসাগর স্বাক্ষন শুরু করলেন। বিরোধী পক্ষ এর বিরেধীতার জন্য পাল্টা স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজে নেমে পড়লেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর পিছিয়ে যাওয়া চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি লোকাচারকে ধর্ম বলে চালিয়ে যাওয়া ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তিনি যুক্তি তর্কের সাহায্যে বিধবাদের স্বপক্ষে লিখতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন শুধু যুক্তি তর্ক দিয়ে ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে বোঝানো সম্ভব নয়। তাই তিনি ধর্মশাস্ত্র থেকে প্রমাণ খুঁজে বের করলেন। পরাশর সংহিতার শ্লোক থেকে তিনি প্রমাণ করেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। অবশেষে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হল। আইন পাশ হলেও বিধবা বিবাহ কার্যকরী করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাই পুনরায় বিধবা বিবাহ বাস্তবে কার্যকরী করার আন্দোলন চলতে থাকল। এছাড়া সেই সময় কুলীন সমাজের মধ্যে বহুবিবাহ নামক কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ফলে বিদ্যাসাগর আবার বহুবিবাহ আন্দোলন গড়ে তুললেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রোধের আন্দোলনের জন্যই বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিদ্যাসাগরের জন্যই বর্তমানে বিধবাবিবাহ অনেক সহজ হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের জীবনে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গায় স্কুল স্থাপন করলেন। তৎকালে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিরোধীদের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করলে বিধবা হয়' এই আপত্তিকর বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে খন্ডন করেন। সমাজের বাধাকে অগ্রাহ্য করে ৭ মাসের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এইসব বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০। তিনি যদি সেইসময় মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে না আসতেন তবে হয়ত মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি আরও পিছিয়ে পড়ত। আজ যে মেয়েরা ঘরের বাইরে

 ISSN-2277-8780

বেরিয়ে স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে তাতে বিদ্যাসাগরের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা গদ্যের যে শৈলী আমরা অনুসরণ করি তা বিদ্যাসাগরেরই দান। তিনি বাংলা গদ্যে ছন্দ, যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন। এরফলে বাংলা গদ্য সহজবোধ্য ও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতে, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।" এছাড়া আরও বলেছিলেন বিদ্যাসাগরের "প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা"। তাই বলা যেতে পারে যে তিনি যদি শুধু এটুকুই করতেন তাহলেও তিনি আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকতেন।

ফোর্ট উইলিয়াম ও সংস্কৃত কলেজে চাকুরী করাকালীন এবং শিক্ষাবিস্তার এর কাজে যুক্ত থাকাকালীন বিদ্যাসাগর বাংলাভাষায় সহজবোধ্য শিশুপাঠ্য বইয়ের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। শিশুশিক্ষার জন্য তিনি কিছু অনুবাদমূলক ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। বইগুলি যদিও কালানুক্রমিক ভাবে প্রকাশিত হয়নি তবুও এগুলি এমন পারম্পর্য রেখে রচিত যে শিশু বয়স থেকে কৈশোর কাল পর্যন্ত ধারাবাহিক শিক্ষণ কার্যকর করা যায়। প্রথমে 'বর্ণপরিচয়' দুইভাগ, তারপরে 'কথামালা', তারপরে 'বোধোদয়'। শিশু 'বোধোদয়' পর্যন্ত পৌঁছালে তার ভাষাজ্ঞান বাঞ্ছিত স্তরে এসে পৌঁছায়। এরপর 'আখ্যান মঞ্জরী', 'চরিতাবলী', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা'। ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য রচনা করেন 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'ঋজুপাঠ'। বিদ্যাসাগর যদি বইগুলি রচনা না করতেন তাহলে বাংলা ভাষা শিক্ষা অনেক কঠিন ও জটিল হয়ে পড়ত। এখন তার শিশুপাঠ্য বইগুলি শিশুশিক্ষার জন্য সমান জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক।

ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগর অসহায়, দরিদ্র, পীড়িত ব্যক্তিদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। বিদেশে ঋণগ্রস্থ অবস্থায় থাকাকালীন মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও তিনি অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া ১২৭২-৭৩ বঙ্গাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষদের রক্ষার জন্য বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খোলেন এবং সরকারী সাহায্যে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অন্নসত্র স্থাপন করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিও ছিল তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। বর্ধমানে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাড়িতে থাকাকালীন নিকটস্থ মুসলমান পল্লী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলে নিজের বাড়িতে ডিসপেন্সারী স্থাপন করেন। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস করেন। এমনকি চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয়ভার বহন করেন। দরিদ্র গ্রামবাসীদেরকে প্রত্যেক মাসে অর্থ সাহায্য করতেন। অনেক দরিদ্র ছাত্রদের নিজের বাড়িতে এবং কলকাতার বাসায় রেখে লেখাপড়া শেখাতেন। কর্মটারে থাকাকালীন সাঁওতালদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। বর্তমান সময়ে বিদ্যাসাগরের মত বহু ব্যক্তির প্রয়োজন যারা দরিদ্র, অসহায়, পীড়িত, প্রান্তবর্গীয় ব্যক্তিদের সমাজে এগিয়ে আসতে সাহায্য করবে। যার ফলে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিরাও সমাজে এগিয়ে যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিস্তারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শিক্ষা প্রসারের কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তিনি কখনও নীতিহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। অ্যাটকিনসন সাহেব ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করার জন্য বিদ্যাসাগরকে ঐ কমিটির সদস্য হতে অনুরোধ করেন। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর অ্যাটকিনসন

ISSN-2277-8780

সাহেবকে জানান যে, যেহেতু তিনি বহু পুস্তকের রচয়িতা তাই ঐ কমিটিতে তিনি থাকতে পারবেন না। বর্তমান সময়ে শিক্ষাজগতের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে এই ঘটনা আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করবে।

বিদ্যাসাগর- এর ঈশ্বরভক্তির তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি মাতাপিতাকে ঈশ্বরতুল্য ভক্তি করতেন। মাতা পিতার প্রতি তার যে শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তা বর্তমান সময়ে খুবই প্রয়োজন। কারণ এখনকার অনেক সন্তান তাদের পিতামাতাকে বোঝা স্বরূপ মনে করে। বৃদ্ধ বয়সে তাদের সেবা যত্ন করে না। তাই বিদ্যাসাগরের মতো মাতৃভক্ত পিতৃভক্ত সন্তান আমাদের সমাজে আজ খুব বেশি করে দরকার।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ হল তিনি যা বলতেন বা সঠিক বলে মনে করতেন সেটি কার্যকর করার জন্য জীবনপণ লড়াই করতে পিছপা হতেন না। আমরা যদি এই বিষয়টি নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে ব্যক্তি জীবন এবং সমাজজীবনের অগ্রগতি ঘটবে। কারণ আমরা অনেক সময় অনেক কথা বললেও সেটাকে বাস্তবে কার্যকর করি না। তার এই চারিত্রিক দৃঢ়তা সমকালে সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস জোগাবে। বিদ্যাসাগর তার কর্ম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য জন্মের দুইশত বছর পরে আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র ঃ—

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচন্ডীচরণ (১৩৯৪ বাংলা)। বিদ্যাসাগর। দে বুক স্টোর, কলকাতা।
২। বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র (১৯৯২)। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রমনিবাস। চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।
৩। বসু, স্বপন (১৯৯৩)। সমকালে বিদ্যাসাগর। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৪। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা - বিমান বসু। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কলকাতা।